সমকাল

তারিখ 25 FEB 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমছে কেন?

শিক্ষা | আসিফ

সাংবাদিক

প্রায় দুই যুগ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা বা বিজ্ঞানবিষয়ক কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল শুধু কিশোর-তরুণদের মধ্যে নয়, সব বয়সের মানুষের মধ্যেই দেখেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ে তাদের প্রবল আগ্রহ, বিজ্ঞান আলোচনায় তারা আনন্দ পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, তারা তাদের শিক্ষাজীবনে এই আগ্রহটুকু ধরে রাখেননি অথবা সমর্থ হননি। কিন্তু তারা চেয়েছেন এর মধ্য দিয়ে পথ চলতে।

কেন এ রকম হচ্ছে, সে প্রশ্ন নিজের মধ্যেও বহুবার জেগেছে। কিছু উত্তরও এসেছে। যেমন বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলো এমন, যা কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের তুলে আনতে পারে না। ফলে কৌতূহলীরা ঝরে পড়ে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ দেশে চাকরির সুযোগ অনেক কম। ফলে আগ্রহীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে উৎসাহবোধ করেন না। এই মনোভাবটি তাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রবাহিত হয়। তারা মনে করেন, কসমোলজি জানবে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব জানবে, স্টিফেন হকিংয়ের কথা শুনে উল্লসিত বোধ করবে; কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় যাবে না। এটা প্রজন্ম পরম্পরায় প্রভাব তৈরি করছে।

এর মধ্যেও যারা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন তাদের বেশিরভাগ হচ্ছে, পরীক্ষার লটারিতে এ বিষয়টি অধ্যয়নের সুযোগ মিলেছে মাত্র। বিজ্ঞানের প্রতি কোনো আগ্রহ তাদের এখানে কাজ করছে না। আগে থেকে মানসিক কোনো প্রস্তুতিও শিক্ষার্থীরা নেননি। তারপর কখনও কখনও পড়তে পড়তে কোনো বিষয় ভালো লেগে যায়। শিক্ষার্থীরা মজা পেয়ে যান, কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার প্রক্রিয়াটা এমন যে, সে মজাটা তুলে আনা কঠিন ব্যাপার। এ ব্যাপারে দ্বিজেন শর্মা বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানের অনেক ধরনের বিষয় আছে। কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যা প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্য পাঠ্য। তা হলো 'বিজ্ঞানের ইতিহাস'। বিজ্ঞানের ইতিহাস হচ্ছে প্রত্যেকটি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পেছনের যে সুখ-দুঃখ ও সামাজিক কার্যকারণ বিরাজমান, তার বর্ণনা এবং বিশ্লেষণকে তুলে ধরা। তখন একজন বিজ্ঞান শিক্ষার্থী বুঝতে পারে এই আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পেছনে যারা আছেন তারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, আমাদের মতোই তাদের হাসি-কান্নার অভিজ্ঞতা রয়েছে। পার্থক্য শুধু অভিজ্ঞতাকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা। সে যখন বিজ্ঞানের প্রতি নৈকট্য অনুভব করে, তখন জায়গাটি তার কাছে খটখটে বিষয় থাকে না, নিজেকে উন্মোচনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর কোনো বিষয় নেই। এ ব্যাপারে কিছু বললে সংশ্লিষ্টরা বলেন, বিজ্ঞানই ঠিকমতো পড়ানো হয় না, আবার এর মধ্যে বিজ্ঞানের ইতিহাস। ফলে আমাদের দেশে বিজ্ঞান কতগুলো তত্ত্ব মুখস্থ করা অথবা যন্ত্র উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়। একেবারেই একটি নিরেট টেকনিক্যাল বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। ফলে চাকরি পাওয়ার হাতিয়ার ছাড়া আর কোনোভাবে এটাকে শিক্ষার্থীরা বিবেচনা করেন না। ফলে এর প্রতি না থাকে আগ্রহ, না থাকে ভালোবাসা। অথচ শিক্ষার মূল কাজ হচ্ছে সেই ভালোবাসা, সেই আবেগ-অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। সেই মানবিক বোধগুলোর বিকাশ ঘটানো, যার দ্বারা সমাজের অন্য আর দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাকে সৃজনশীলভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করানো, যাতে নিজের জায়গাটি খুঁজে নিতে পারে, সমাজে চিন্তা দিয়ে, কাজ দিয়ে অবদান রাখতে পারে। আইনস্টাইন ১০০ বছর আগে বলে গেছেন, বিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানী করে গড়ে তোলা নয় বরং সেই মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে দেওয়া, যাতে সে সমাজের সঙ্গে চলতে পারে এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিনিময় করতে পারে। তাতেই তার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে। কাজেকর্মে অবদান রাখতে পারবে।

দুর্ভাগ্য হচ্ছে, শিক্ষাকে আমরা ভালো চাকরির অস্ত্র হিসেবে দেখেছি। আর এর জন্য দরকার স্কোর। ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেতে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থীরা দারুণভাবে হতাশ হয়। সামাজিকভাবে এত নিন্দিত হয় যে, অনেক সময় দেখা যায় আত্মহত্যাও করে বসে। ভালো ফল না এলে কী হবে, এই চিন্তা কারও পক্ষে কোনো কিছু নিয়ে সুস্থিরভাবে চিন্তা করাই সম্ভব নয়। কোনো রকম বোঝাপড়া ছাড়া একজন শিক্ষার্থীর একের পর এক ক্লাস টপকানো কোনো মানবিক বোধ তৈরিতে সামর্থ্য হয় না। তারপর আছে পাঠ্যবইয়ের বিষয়গত অপর্যাপ্ততা। ফলে বিজ্ঞান কিশোর-তরুণদের মধ্যে পৌঁছুচ্ছে না। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের মারাত্মক অনীহা দেখা দিয়েছে। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এর অবস্থাটা পরিমাপ করা যেতে পারে। ১৯৯০ সালে মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থী ছিল ৪২ দশমিক ৮১ শতাংশ। ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিকে এই হার দাঁড়িয়েছে ২৫.৪০ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় ৩৪ শতাংশ শিক্ষার্থী ছিল বিজ্ঞান বিভাগের। ২০০৮ সালে ২৩.৭৬ শতাংশ। ২০১৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ২২ দশমিক ৩৫ শতাংশ। ১৯৯০ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ২৮ দশমিক ১৩ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ১৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এর পর ২০০২ সালে তা বেড়ে হয় ২৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। ২০০৮ সালে তা হয় ১৯.৪১ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে তা নেমে আসে ১৭ দশমিক শূন্য ১ শতাংশে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক সম্মান পর্যায়ে এই সংখ্যা আরও ভয়াবহ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে, ২০০৬ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিল ১৭ শতাংশ; কিন্তু বর্তমানে তা কমে হয়েছে ১১ শতাংশ!

জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে গমন বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক হিসাবে, গত আট বছরে বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী কমার হার ৩১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। পরিসংখ্যান বলছে, বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। অন্যদিকে ব্যবসা প্রশাসন ও ব্যবসাবিষয়ক অধ্যয়নে শিক্ষার্থী বাড়ছে। প্রায় পাঁচগুণ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে প্রায় দ্বিগুণ হারে এই বৃদ্ধি।

অধ্যাপক ড. আলী আসগর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার পেছনে চাকরির সীমিত সুযোগকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, ভালো শিক্ষকের অভাব, যারা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে পারে, সমাজকে আশান্বিত করতে পারে এবং বিজ্ঞানের পড়ায় আগ্রহী করে তুলতে পারে। কিন্তু এও সত্য, একজন ভালো শিক্ষকের গড়ে ওঠার পেছনে সামাজিক মূল্যায়নও চাই। আর আমাদের সংস্কৃতিতে রয়েছে বিজ্ঞানকে গ্রহণ না করার প্রবণতা। এ ছাড়াও আছে মেধা পাচার। বিদেশি জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের আকর্ষণ নেই, রয়েছে বিদেশি অর্থের প্রতি লোভ। তখন ধনী দেশগুলো নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে এ ধরনের মানুষদের দিয়ে গরিব দেশগুলোর ওপর তাদের উদ্দেশ্যকে চাপিয়ে দেয়। অধ্যাপক আলী আসগর বলেন, টেক্সট বইয়ের উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল; কিন্তু বিদেশিরা অর্থ দেওয়ার সুবাদে তাদের হস্তক্ষেপ বাড়িয়েছে এবং পদক্ষেপগুলো কার্যকর করা যাচ্ছে না।

সবকিছু থেকে এটা পরিষ্কার যে, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের কৌতূহল ক্রমেই কমছে। বিজ্ঞানকে সবকিছু করে দেওয়া জাদুর যন্ত্র হিসেবেই সবাই দেখছে, যা ভোজবাজি ঘটিয়ে কিছু একটা করে দেবে। অথচ বিজ্ঞান হচ্ছে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তৈরি একটি প্রক্রিয়া। ফলে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশ ঘটছে না। বিজ্ঞান হচ্ছে মহাবিশ্বকে বোঝা, মহাবিশ্বের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে অনুধাবন করা। নিজের দেশের পলিমাটির সঙ্গে বিজ্ঞানকে আত্তীকরণ করে না দেখতে পারলে বিজ্ঞানের বিশ্বজনীন ব্যাপারকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। এ জন্যই অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন স্বদেশী পরিমণ্ডলে বিজ্ঞানের গবেষণা ও শিক্ষায় কাজ করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০ বছর আগে মহাজগতের নিয়মাবলি, পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিবর্তনের তথ্যগুলো দিয়ে 'বিশ্বপরিচয়' নামে কসমোলজির একটি সহজবোধ্য বই লিখেছিলেন।